Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-IV, July 2020, Page No. 01-08
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাংলা ছোটগল্পে প্রতিফলিত লোকজীবনে শ্রীচৈতন্য প্রভাব

মুনমুন দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

The essence of Vaishnava religion introduced by Sri Chaitanyadev was to distribute love and devotion equally to all people above caste, religion and to establish humanism. The ideology of Mahaprabhu's great religion and liberal humanity has influenced the lives of the people of lower caste and rural Bengal and its real image is reflected in the short stories written by Rabindranath Tagore, Saratchandra Chottopadhyay and Tarasankar Bandopadhyay in Bengali literature. This is highlited in my article.

Keywords: Chaitanyadev, Vaishnava religion, liberal humanity, humanism, Bengali literature, short stories.

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ষোড়শ শতকে বাংলার সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনায় যে নবজাগরণ ঘটেছিল তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব আজও প্রবহমান। চৈতন্যদেব যে নব্য বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন তার মূল কথাই ছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে সমস্ত মানুষকে প্রেমভক্তি বিতরণ। মহাপ্রভুর এই উদার প্রেমধর্মই গ্রাম বাংলার জনজীবনকে বিশেষত নিম্নশ্রেণির মানুষকে আলোড়িত করেছিল। গৌরাঙ্গের বর্ণভেদ বিরোধী মানবিক উদারনীতির আহ্বানে অনুপ্রাণিত, ভক্তির অর্ন্তনিহিত সাম্য ও মানবিকতায় উদ্বুদ্ধ সংখ্যা গরিষ্ঠ নিম্নবর্ণ ও বর্ণহীন পল্লীবাংলার মানুষের জীবনের সত্য চিত্রই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে বাংলা ছোটগল্পগুলিতে।

ছোটগল্প অনন্তে প্রসৃত মানব জীবনের রূপকে একটি মুহূর্তের অতলে একান্ত করে ব্যঞ্জিত করে তোলে । বিন্দুতে সিন্ধুর আস্বাদ দেওয়াই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ছোটগল্প মানব জীবনের যে কোনো একটি মাত্র মুহূর্তের অভিভবতার অতলে সম্পূর্ণ অখণ্ড জীবনকে বিম্বিত করে থাকে। আর বাংলা ছোটগল্পের প্রথম যথার্থ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। পল্লীজীবনের হৃদয়ের দ্বার তিনি উন্মোচিত করলেন ছোটগল্পে । প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বিশেষত বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি কবিগুরুর গভীর অনুরাগের কথা আমরা সকলেই জানি। কেবল বৈষ্ণব পদাবলীই নয় বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য এবং বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের গভীর প্রভাব তাঁর সাহিত্যে লক্ষ করা যায়।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই সবুজপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত 'বোষ্টমী' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ আনন্দি বোষ্টমীর মধ্য দিয়ে যথার্থ বৈষ্ণবের এক স্বতন্ত্র রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। বোষ্টমীর সহজ সরল জীবনধারণ, কথাবার্তা, ব্যবহার, ঈশ্বরের প্রতি অকুণ্ঠ ভক্তি, যে কোনো সুন্দরের মধ্যে ভগবানের

প্রকাশ উপলব্ধি – তাকে যথার্থ বৈষ্ণবীয় প্রমের মূর্তিস্বরূপিনী করে তুলেছে। লেখক তাঁর মধ্য দিয়ে এক নৈব্যক্তিক সর্বজনীন প্রেমভক্তির রূপ উপলব্ধি করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে হেমন্তবালা দেবীকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন --- "*মানুষের সেবাতেই ঈশ্বরের সেবা। শিলাইদহের বৈষ্ণবীর আচরণে এই সত্যের আভাস পেয়েছিলাম"।*[১] গল্পে বোষ্টমীর কথাতেও তারই উল্লেখ রয়েছে--- *"তাহার কথাটা এই যে , শুধু মত লইয়া কী হইবে- সত্য যে চাই। ভগবান সর্বব্যাপী । এটা একটা কথা, কিন্তু যেখানে আমি তাহাকে দেখি সেখানেই তিনি আমার সত্য" ।*[২] জীবের মধ্য দিয়েই যে রসস্বরূপ ঈশ্বরের প্রকাশ বৈষ্ণবীর ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের কাছে তা আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কোনো ধর্মনীতি প্রবুদ্ধ বৈষ্ণব ভাবাদর্শের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন নি, নিজস্ব ভাবকল্পনায় এক বিশ্বজনীন মূল্যমানে তাকে গ্রহণ করেছিলেন। হেমন্তবালাদেবীকে তিনি লিখেছিলেন- "*আমার মধ্যে বৈষ্ণবকে তুমি খোঁজো। সে পালায় নি। কিন্তু তার সঙ্গেই আছে শৈব ভিখারী এবং সন্ন্যাসী। রসরাজের বাঁশিও বাজে নটরাজের নৃত্যও হয়*।"[৩]

এ থেকে বোঝা যায় কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মচেতনার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আবদ্ধ নয়। তাঁর কাছে ধর্ম মানেই মনুষ্যত্ব যেখানে মানুষের পরিপূর্ণতার বিকাশ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য চৈতন্যদেবও কিন্তু প্রচলিত বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বকে বড় করে দেখেন নি। শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিনিষেধকে তিনি কখনও গুরুত্ব দেন নি। তিনি তত্ত্ব নিরপেক্ষ কেবল প্রেমভক্তির দ্বারাই সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণের মানুষকে একত্র সম্মিলিত করতে চেয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের এই আদর্শের প্রতিফলনই আমরা বৈষ্ণবী চরিত্রে লক্ষ্য করে থাকি।

আনন্দী বোষ্টমীর বৈষ্ণবতা শাস্ত্রীয় নয়, প্রাকৃত। সে তার গুরুকে দেখেছে গৌরের মূর্তিতে, আর তাই রবীন্দ্রনাথের সামনে গুরুর কথা বলতে গিয়ে সে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গেয়ে উঠেছে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ --

"অরুণ কিরণখানি তরুণ অমৃতে ছানি
কোন বিধি নিরমিল দেহা।'[৪]

গল্পে দেখা যায় যে গুরুঠাকুরের প্রতি আনন্দী বোষ্টমী তার হৃদয়ের ভক্তি-ভালবাসা উৎসর্গ করেছিলেন সেই গুরু কিন্তু তার ভক্তির মান রক্ষা করতে পারেন নি। উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে ধর্মাধিকারি গুরু ঠাকুরের গোপন লালসাবৃত্তি। পরিণামে সংসার ত্যাগ করতে হয়েছে আনন্দী বোষ্টমীকে।

রবীন্দ্রনাথ বার বার সচেতন করে দিয়েছেন যে রসসম্ভোগের মাত্রাতিরিক্ততা পরিণামে বিকারের রূপ নেয়। এর দৃষ্টান্ত আমরা 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যার মধ্যে পেয়েছি। তাছাড়া জীবনবিচ্ছিন্ন রসচর্চার দুর্বলতার দিকটি 'উদ্ধার' গল্পের পরমানন্দস্বামীর চরিত্রেও দেখতে পাই। স্বামীসুখ বঞ্চিতা পুত্রহীনা গৌরী সংসারের দুঃখ-কষ্ট, স্বামীর সন্দেহভাজন অন্যায় অত্যাচারে বিতিক্ত হয়ে গুরুর সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছিল কিন্তু অচিরেই তার সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে ভক্তির আড়ালে গুরুদেবের কামনার চৌর্যবৃত্তি, নিঃশেষিত হয়ে যায় গৌরীর সমস্ত ভক্তি, বিষপান করে তাকে সহমৃতা হতে হয়।

বৈষ্ণবধর্মের এই দুর্বলতার দিকটি সম্পর্কে চৈতন্যদেবও ওয়াকিবহাল ছিলেন। এজন্য তিনি নিজে যেমন কঠোর সংযম রক্ষা করে চলতেন, তেমনি শিষ্যদেরও সংযমী জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করতেন। কোনোরকম দুর্বলতা প্রকাশ পেলে তিনি তিরস্কার করতে ছাড়তেন না। হরিদাসকে তাঁর অসংযমী আচরণের জন্য শাস্তি দানের কথা আমরা সকলেই জানি। আবার, একদা জগদানন্দ তাঁর জন্য সুগন্ধি তেল নিয়ে এলে তিনি জগদানন্দকেও যার পরনাই তিরস্কার করেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতের' অন্ত্যলীলায় রয়েছেঃ

"প্রভু কহে সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার।/ তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার।।/ জগন্নাথে দেহ তৈল দীপ যেন জ্বলে।/ তাঁর পরিশ্রম হৈব পরম সফলে।।"[৫]

চৈতন্যদেব যে কীর্তন গানের মাধ্যমে সমগ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষে বিরাট প্লাবন নিয়ে এসেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সানন্দে সেই কীর্তনকে গ্রহন করে তাকে আরও ব্যাপ্তি দিলেন সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ; কখনো চরিত্রের মনঃবিশ্লেষণে, কখনো পরিস্থিতি পরিস্ফুটনে, কখনো বা প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনায়। কখনো মহেন্দ্রের মনের প্রসন্নতা বোঝাতে লেখক বৈষ্ণব ভিক্ষুকের খোল করতাল বাজিয়ে কীর্তন গানের কথা উল্লেখ করেন (২৯ পরিচ্ছেদ, 'চোখের বালি'), কখনো বিনয়ের মনোভাব প্রকাশে বাউল সঙ্গীতের প্রসঙ্গ আনেনঃ "আলখাল্লা পরা একটা বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল _ *'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়,/ ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম পাখির পায়'।"*[৬] (গোরা,প্রথম পরিচ্ছেদ)। আবার 'পোস্টমাস্টার' গল্পে পল্লীপ্রকৃতির নিপুণ বর্ণনায় উঠে আসে বাউলদের কীর্তন গানের প্রসঙ্গঃ "*সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কূণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোল করতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃ স্বরে গান জুড়িয়া দিত---"*।[৭] আবার 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে নিবারণের নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাত্রার পারিপার্শ্বিকে এসেছে 'বৈষ্ণব ভিখারির গানে'র প্রসঙ্গ ।

সর্বোপরি কীর্তন গানের সার্থক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে শশিভূষণের মানসিক চরিত্র বিশ্লেষণে। জেলফেরত শশিভূষণকে তার প্রিয়জনই যে আহ্বান করে নিয়ে যাচ্ছে তারই গীতিমধুর ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হয় এই পদটিতে -

"এসো এসো ফিরে এসো - নাথ হে, ফিরে এসো
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত,
বঁধু হে ফিরে এসো।"[৮]

বৈষ্ণব ভিখারির এই গানের ছন্দে শশিভূষণের হৃদয় আন্দোলিত হয়ে ওঠে এবং সে আপন মনে পদের পর পদ রচনা করতে থাকে। কাহিনির পরিণতিতে বিধবা গিরিবালার সঙ্গে তাঁর মিলন, উভয়ের চোখের জলে প্রেমানুরাগের করুণ রাগিণী যেন গীতিমূর্চ্ছনায় রূপান্তরিত হয়ে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করতে থাকে -'এসো এসো হে'।শশিভূষণের জীবননাট্যের কঠিন বাস্তবতার শেষে এই ভাবোল্লাস এক বিশেষ মাত্রায় পাঠকের মনকে দুলিয়ে দেয়। আর এভাবেই চৈতন্য প্রবর্তিত কীর্তন রবীন্দ্রনাথের হাতে নব তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

সাহিত্যের আকাশে আর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর ছোটগল্পে হৃদয়ধর্ম তথা মানবধর্মের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় । শ্রীচৈতন্যদেবও মানবধর্মই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এই সূত্রে তাঁকে চৈতন্যগোত্রীয় বৈষ্ণবপন্থি শিল্পী বলা যায়।তাঁর ছোটগল্পে দু-ধরনের বিষয়বস্তুর সন্ধান মেলে, একদিকে প্রেমের নানা আকর্ষণ বিকর্ষণ অন্যদিকে স্নেহ বাৎসল্যের তির্যক গতি। আর এর মধ্যেই নিহিত আছে তাঁর বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ। কোনো কোনো ছোটগল্পে প্রত্যক্ষভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবও দেখা যায়।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে । এই গল্পের অন্যতম চরিত্র ঘনশ্যাম একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। তিনি সৎ, কর্তব্যপরায়ন, সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল, উদারহৃদয়, নিরহঙ্কার মানুষ।

যথার্থ বৈষ্ণবের গুনাবলি তাঁর চরিত্রে উপস্থিত। বৈষ্ণব ধর্মের আচার পরায়ণতার উর্দ্ধে এই ধর্মের মূল সত্যটিকে তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন ও আপন জীবনে তা পালন করেছেন। তাঁর উক্তিঃ " *আমি বোষ্টম, আমার তো নিজের উপর অত্যাচারে রাগ করতে নেই। মহাপ্রভু আমাদের গাছের মত সহিষ্ণু হতে বলেছেন"।* [৯]

শ্রীচৈতন্যের 'শিক্ষাষ্টক' এর তৃতীয় শ্লোকে বলা হয়েছেঃ
"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ।।" [১০]

সে কথাই ঘনশ্যাম আন্তরিক নিষ্ঠায় পালন করেছেন নিজের জীবনাচরণে। স্ত্রী সৌদামিনিকে তিনি বলেছেন *"যে সত্যি ক্ষমা চায় তাকে করতেই হবে, এ যে আমাদের মহাপ্রভুর আদেশ গো"* ।[১১] তাই তো রাতের অন্ধকারে নরেনের সঙ্গে পালিয়ে গেলেও স্ত্রীর এত বড় অন্যায় অপরাধ তিনি ক্ষমা করতে পেরেছেন হৃদয়ের সহজাত ঔদার্য্যে। তাকে দেখে সৌদামিনির মনে হয় *"মহাপ্রভুর শাসন কি অক্ষয় কবচের মতই যে তার মনটিকে অহর্নিশ ঘিরে রক্ষা করতো,আমার তীক্ষ্ণ শূলও খান খান হয়ে পড়ে গেল"।*[১২] এইখানে মহাপ্রভুর আদর্শের গভীর প্রতিফলন লক্ষ করা যায় ঘনশ্যাম চরিত্রে।

আবার বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে পঞ্চরসের মধ্যে বাৎসল্য রসের পরিচয় পাওয়া যায় শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'মেজদিদি', 'নিষ্কৃতি', বৈকুণ্ঠের উইল', 'মামলার ফল' প্রভৃতি গল্পে। কিন্তু এখানে স্নেহ- বাৎসল্যের পথ স্বাভাবিক কিংবা মসৃন নয়, বরং তির্যক গতিসম্পন্ন। কোথাও সতীন পুত্র, কোথাও দেওরর ছেলে, কোথাওবা পুত্র তুল্য দেওরের মধ্যে দিয়ে এই স্নেহ-বাৎসল্যের প্রকাশ ঘটেছে। 'রামের সুমতি' গল্পে ভ্রাতৃপ্রতিম রামলালের প্রতি মাতৃসমা বৌদি নারায়নীর স্নেহাতিশয্য সাংসারিক নানাবিধ ঈর্ষা-বিদ্বেষ জটিলতাকে অতিক্রম করে গেছে; 'মেজদিদি' তে পাঁচুকে ফিরিয়ে আনার জন্য নিজের ঘর সংসার অনায়াসে ত্যাগ করেছে মেজদিদি; 'মামলার ফল' গল্পে ভ্রাতৃবিরোধে দ্বিধাবিচ্ছিন্ন পরিবারের মধ্যে ছোটো ভাইয়ের ছেলে বড় ভাইয়ের স্ত্রীর দ্বারা লালিত পালিত হয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে; ঠিক একই ছবি ধরা পড়ে 'বিন্দুর ছেলে' গল্পে। বড় জায়ের একমাত্র ছেলে অমূল্যকে ছোটো বৌ বিন্দু নিজের সন্তানের মত করে মানুষ করে তোলে। অমূল্যর প্রতি তাই বিন্দুর অধিকার সুবিস্তৃত ও গভীর। অমূল্য একদিন বড় হয়ে সকলের মুখ উজ্জ্বল করবে, দেশের লোক বিন্দুকে দেখিয়ে বলবে ঐ অমূল্যের মা, এই আশায় বিন্দু বেঁচে থাকে। কৃষ্ণ যশোদার গর্ভজাত নন, কিন্তু তিনি যশোদা দুলাল । যশোদার পুত্রস্নেহই যেন রূপ পেয়েছে নারায়নী, বিন্দুবাসিনী, কুসুম, পিয়ারীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে। প্রখ্যাত সমালোচকের কথায়- " *শরৎচন্দ্র ---নারী হৃদয়ের বাৎসল্যের বহু চিত্র আঁকিয়াছেন।----তাঁহার শ্রেষ্ঠ চিত্রে মাতৃস্নেহ ক্ষরিত হইয়াছে স্বীয় গর্ভজাত সন্তানের জন্য ততটা নয়, যতটা ঈষৎ দূর সম্পর্কিত সন্তান স্থানীয় আত্মীয়ের জন্য।"*[১৩]

শরৎচন্দ্রের গল্পগুলিকে বিশ্লেষণ করলে বৈষ্ণব ভাবধারার বিচিত্র গতি ধরা পড়ে। লেখক কখনো বাৎসল্য রসের ফল্গুধারা সৃষ্টি করেছেন, কখনো মধুর রসকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আবার কোথাওবা তাঁর আউল-বাউল বৈরাগী স্বভাবকে নানান চরিত্রের আঙ্গিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে 'মন্দির' গল্পের অপর্ণা চরিত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম থেকেই ঈশ্বরের আরাধনায় নিমগ্ন অপর্ণা বিবাহের পর স্বামী অমরনাথকে মন থেকে ভালোবাসতে পারে নি। তার মনে সর্বদা বিরাজ করত মদনমোহন। অপর্ণার এই অবস্থার সঙ্গে আমরা নিমাইয়ের তুলনা করতে পারি। নিমাই তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াকে

মন থেকে গ্রহণ করতে পারেন নি। সেই সময় তিনি ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমে নিমগ্ন। হরিনাম প্রচারের মধ্য দিয়ে সর্বজীবে প্রেমভক্তি প্রদানের নিমিত্ত তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।

চৈতন্যদেব ছিলেন প্রকৃতই পতিতপাবন। হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতায় নিপীড়িত মানুষ, কথায় কথায় যাদের জাত যায়,সেই সকল সমাজবিচ্যুত বঞ্চিত মানুষ চৈতন্যদেবের প্রচেষ্টায় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে পুনরায় সমাজে তাদের প্রাপ্য সম্মান ফিরে পায়। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'একাদশী বৈরাগী' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গল্পে দেখা যায় একটি অসহায় বিধবা মেয়েকে তার প্রথম জীবনের পদস্খলনের জন্য সমাজ অচ্ছুত করে রাখে, আর তাকে সাহায্য করার জন্য তার পরমাত্মীয়কে পর্যন্ত সমাজবিচ্যুত করা হয়। *"--- অতঃপর গ্রামে তাহার ধোপা- নাপিত-মুদি প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গেল। একাদশী নিরুপায় হইয়া ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়া এই বারুইপুরে পলাইয়া আসিল।"*[১৪] হিন্দু সমাজের এই নির্মমতার প্রতিবাদে বৈষ্ণব সমাজ এই অসহায়দের স্থান দিয়ে মানবিকতার পরিচয় বহন করে। এখানেই শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত নব্য বৈষ্ণবধর্মে পতিতদের উদ্ধারের বৃহৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করে।

এই গল্পগুলিতে উঠে আসে রক্তমাংসে গড়া বাস্তব মানুষের কথা। আর এগুলি থেকেই বোঝা যায় চৈতন্যদেবের মৃত্যুর শত শত বৎসর পরেও বৈষ্ণবধর্ম তথা বৈষ্ণব সমাজ আজও হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতা থেকে অত্যাচার থেকে সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করে চলেছে। শ্রীচৈতন্যদেবের এই উদার ধর্মনীতি সাম্যবাদী প্রচেষ্টা যে সুদূরপ্রসারী ফল লাভ করেছিল বাংলা ছোটগল্পগুলি তার সার্থক নিদর্শন। এই নিদর্শন আরও সার্থকতা লাভ করে রাঢ় বাংলার বিখ্যাত ছোটগল্পকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে। তাঁর রচনায় গ্রামবাংলার বাউল-বোষ্টম-বৈরাগীদের জীবন ও জীবিকার এবং মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের বাস্তব সত্য চিত্রই প্রতিফলিত হয়ে ওঠে।

'রাধারানী' গল্পে দেখা যায় একটি দশ-বারো বছরের ছেলে গৌরদাস কৃষ্ণযাত্রা পালায় শ্রীমতি রাধার ভূমিকায় অভিনয় করে। এই গৌরদাস জাত বৈষ্ণব নয়, সে এক কুলহারা বারাঙ্গনার সন্তান। তার সম্পর্কে যাত্রা দলের অধিকারীকে বলতে শোনা যায় "*রাধাকৃষ্ণের লীলায় ওকে রাধা সাজাই; সেই পুন্যে ওর পাপ ধুয়ে মুছে যাবে বলেই আশা করি। ভাল করে একটু অধিকার হলেই আমি ওকে বৈষ্ণব করে দোব। মহাপ্রভুর মহাধর্মে তো জাতি-কুলের বিচার বড় নয় - সে বাধাও নাই;*"[১৫] এইখানে সামাজিক সাম্প্রদায়িক বিভেদ বৈষমের উর্দ্ধে মহাপ্রভুর উদার মানবধর্মেরই জয়ধ্বনি শোনা যায় অধিকারীর কণ্ঠে। 'হরিভক্তিতে নাহি জাত কুলাদি বিচার' - মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের এই আদর্শেরই প্রতিফলন ঘটেছে এখানে।

মহাপ্রভুর মহাধর্ম সাম্যের আদর্শ কেবল ষোড়শ-সপ্তদশ শতকেই মানুষকে উদ্ধার করেছিল তাই নয়, এই ধর্মনীতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহু পিছিয়ে পড়া অন্ত্যজ শ্রেনির মানুষকে উদ্ধারের পথ দেখিয়েছে, তাদের আত্মমর্যাদা বোধে উদ্দীপিত করেছে। অষ্টাদশ শতকে মেছুয়াবাজারের কুজীবাঈ, উনিশ শতকে সোনাগাছির গোলোকমণি রায়ের মত সমাজের প্রান্তবাসিনী রমণীদের কথা উল্লেখ করে রমাকান্ত চক্রবর্তী লিখেছেন "*এই মেয়েরা তাদের জীবনে বৈষ্ণব ধর্মকেই অবলম্বন করে পবিত্রতার দীপশিখাটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন।*"[১৬] মহাপ্রভুর পতিতোদ্ধারের সমাজ সংস্কারের আদর্শে পরবর্তীতে পতিতা বারাঙ্গনা নারী ও তাদের সন্তানেরাও যে মহাপ্রভুর মহাধর্মের ছত্রছায়ায় এসে বৈষ্ণব সমাজে স্থান লাভ করতে পারে তারই সার্থক দৃষ্টান্ত 'রাধারানী' গল্পের গৌরদাস চরিত্রটি।

চৈতন্যদেবের প্রভাবে পরবর্তীতে নারীরাও যে সমাজে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিল তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তারাশঙ্করের 'রসকলি' গল্পের রসকলি চরিত্রটি। ধোপার মেয়ে সৌরভী ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হলেও তার মেয়ে মঞ্জরী যথার্থ বৈষ্ণবের মতই "*নাকে রসকলি কাটে, চূড়া করিয়া চুল বাঁধে, কথার ধরণটাও তাহার কেমন বাঁকা।*"[১৭] এই মঞ্জরী বৈষ্ণব আখড়ার কন্যা। সে যখন পুলিনকে লক্ষ্য করে গান ধরে _

"*লোকে কয় আমি কৃষ্ণ কলঙ্কিনী ,*
সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী গো,
আমি গরবিনী।"[১৮]

ঠিক তখনই আমাদের মনে পড়ে যায় চণ্ডীদাসের রাধার কথা.....

"*কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে*
তাহাতে নাহিকো দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পড়িতে সুখ ।।" [১৯]

তার মধ্যে বৈষ্ণব জাতির স্বরূপ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে মঞ্জরীর ঘরের বর্ণনায় চৈতন্যদেবের মূর্তির উল্লেখে- *"তকতকে ঘরখানি লাল মাটি দিয়া নিকানো, -- দেওয়ালে খানকয়েক পট- সেই পুরানো গোরাচাঁদ, জগন্নাথ, যুগলমিলন; সবগুলির পায়ে চরণচিহ্ন।"*[২০] এইভাবে গোরাচাঁদ পৌঁছে যান বাংলার ঘরে ঘরে। নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে *"বাংলার লোকজীবনে শ্রীচৈতন্যদেব অপেক্ষা গোরা-গৌরাঙ্গ নাম ও মান দুই-ই বেশি"।*[২১] আবার এই মঞ্জরী যখন নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলে ওঠে- "*আমরা জাতে বোষ্টম, ছিঁড়লে মালা আমরা নতুন গাঁথি*"।[২২] তখন শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণব সমাজের পরিবর্তিত রূপ আমাদের সামনে ফুটে ওঠে।

'পৌষলক্ষী' গল্পে আমরা দেখতে পাই তৃতীয় স্ত্রী মারা যাওয়ার পর 'অজগর পুরুষ' মুকুন্দ জ্যোতিষে বিশ্বাসী হয়ে আর বিয়ে না করে জলচল জাতের একটি বিধবা ঝিকে ঘরে এনেছিল এবং বৈষ্ণবদের আখড়ায় কণ্ঠী পরিয়ে বৈষ্ণবী করে ঘরে তুলেছিল।এখানে দেখা যায় জাতবৈষ্ণব সমাজ কিন্তু বিধবার পুনর্বিবাহের স্বীকৃতি দিয়ে তাকে জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ডঃ রমাকান্ত চক্রবর্তী 'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম' গ্রন্থে লিখেছেন, *"বরকন্যার পারস্পরিক কণ্ঠীবদল করে বিবাহ নিষ্পন্ন হত। জাতবৈষ্ণবদের মধ্যে বিধবার পুনর্বিবাহের বিধান ছিল। কিন্তু বিধবার ক্ষেত্রে কন্যাদান হত না। পতি-পত্নীর বৈবাহিক সম্পর্ক ভাল হলে পুনর্বিবাহ অনুমোদিত হত"।*[২৩]

রক্ষনশীল হিন্দু সমাজে যেখানে বিধবাদের অপরিসীম শারীরিক, মানসিক দুঃখ কষ্ট যন্ত্রনা ভোগ করতে হত, যেখানে সংসারের গলগ্রহ মনে করে তাদের ঠেলে দেওয়া হত সহমরণের নৃশংস হত্যালীলায়; সেখানে জাতবৈষ্ণব সমাজ পুনর্বিবাহের স্বীকৃতি দিয়ে বিধবাদের জন্য অন্তত একটি পথ খোলা রেখেছিল, যে পথে লাঘব হতে পারে তাদের অকাল বৈধ্যবের দুঃখ-যন্ত্রনা এবং পূর্ন হতে পারে সংসার রচনার এবং জীবন সৃজনের বাসনা। তাই দেখা যায় বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলনের অনেক আগে থেকেই কিন্তু জাতবৈষ্ণব সমাজে বিধবার পুনর্বিবাহ প্রচলিত ছিল। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের যে সমতার আদর্শে এ সমাজ প্রাণ পেয়েছিল , সেই সমদর্শিতার চেতনাই বিধবা নারীকেও এ সমাজে স্থান করে দিয়েছিল, নতুন করে বেঁচে থাকার পথ দেখিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য- *"ঠিক যাহাকে সমাজ সংস্কার বলে বা য়ুরোপীয় আদর্শে যাহা 'humanism' নামে*

পরিচিত, চৈতন্যদেব সজ্ঞানে তাহার প্রবক্তা বা প্রচারক ছিলেন না ঠিকই; কিন্তু চৈতন্য প্রভাবে সমাজের নিম্নবর্ণেরাও যে উত্তর চৈতন্য যুগে বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার্য।"। [২৪]

তাই তো বাংলার প্রান্তবর্তী অঞ্চলের তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষকেও বৈষ্ণবতার আশ্রয় নিতে দেখা যায়,তাদের কণ্ঠেও বৈষ্ণব পদাবলীর সুর গুঞ্জরিত হতে শোনা যায়। 'যাদুকরী' গল্পে রাঢ় বাংলার এক বিচিত্র জাতি যাদুকর সম্প্রদায়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন - " *বাজিকর একটি বিচিত্র জাতি। ---ধর্মে হিন্দু, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন জাতি বা সম্প্রদায়, জাতিকুল পঞ্জিকা ঘাটিয়াও নির্ণয় করা যায় না। --- নিরীহ শান্ত প্রকৃতি, গলায় তুলসীর মালা, পরনে মোটা তাঁতের কাপড়, দুই কাঁধে দুইটা ঝোলা ও ঢোলক, মুখে এক অদ্ভুত টানের মিষ্ট ভাষা"।* [২৫] এই বাজিকরদের আচার-আচরণে, বেশ-ভূষায়,স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে স্বভাবতই বৈষ্ণবীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এমনকি যাদুকরীর কণ্ঠে শোনা যায় বৈষ্ণবীয় গানের কলি-

"কুল ত্যজিলাম মন সঁপিলাম
কলঙ্কেরই কাজল নিলাম----"। [২৬]

আবার 'বেদেনী' গল্পে রাধা কৃষ্ণের নামের সাদৃশ্যে যুবতী রমণী বেদেনীর রাধিকা ও তার প্রেমিকের কিষ্টো নামকরণ এবং তাদের পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্যে যাযাবর বৃত্তিসুলভ আদিম জীবনযাত্রার ছাপ থাকলেও তারই সঙ্গে মিশে রয়েছে বৈষ্ণব ভাবধারা ও বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্য।

এসবই আসলে চৈতন্যদেবের সর্বধর্ম সমন্বয়ের বৃহৎ প্রেমভাবনার ফসল। আসলে তিনি যখন নবদ্বীপে বৈষ্ণব ভক্তি প্রচার করেন তখন কারও জাত বিচার করেন নি। ডঃ রমাকান্ত চক্রবর্তীর কথায় *"চৈতন্য নিত্যানন্দ প্রচারিত বৈষ্ণব ভক্তি ছিল অতিশয় সম্প্রসারিত সাংস্কৃতিক উপযোজন অথবা acculturation"।* [২৭]

শ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব জাতি-ধর্ম-বর্ণ সমন্বের বিরাট ও মহান আদর্শ, উদার ধর্মনীতি, প্রেমভক্তির সুদূরপ্রসারী প্রভাব যে ষোড়শ-সপ্তদশ শতক ছাড়িয়ে বিংশ-একবিংশ শতকেও বাংলার লোকজীবনে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে বাংলা ছোটগল্পগুলি তারই সার্থক নিদর্শন বহন করে। এইভাবে কথাসাহিত্যিকের হাত ধরে বাংলা ছোটগল্পে প্রতিফলিত লোকজীবনে শ্রীচৈতন্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব অব্যাহত থাকে। আর সেই প্রবহমানতায় সাহিত্যের আকাশে দশকের পর দশক ধরে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ নিমাই পন্ডিত তথা বিশ্বম্ভর তথা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আত্মপ্রকাশ আমরা লক্ষ করে থাকি।

তথ্যসূত্র:

(১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র, নবম খন্ড, বিশ্বভারতী, পত্র ১৯৯, পৃ-৩১৯।
(২) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, বোষ্টমী, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয়, পৃ-৭০৭।
(৩) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র, নবম খন্ড, বিশ্বভারতী, পত্র ১৪, পৃ-৩৩।
(৪) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, বোষ্টমী, প্রাগুক্ত, পৃ-৭০৯।
(৫) সেন, সুকুমার ও মুখোপাধ্যায়, তারাপদ (সম্পা), কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ-৪৬৩।
(৬) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র উপন্যাস সংগ্রহ, গোরা, প্রথম পরিচ্ছেদ, বিশ্বভারতী, পৃ-৫০৯।

(৭) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, পোষ্টমাস্টার, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৬।
(৮) তদেব, মেঘ ও রৌদ্র, দশম পরিচ্ছেদ, পৃ-৩২০।
(৯) চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, শরৎরচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, স্বামী, শুভম, পৃ-৮২৬।
(১০) সেন, সুকুমার ও মুখোপাধ্যায়, তারাপদ (সম্পা), কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ- ৫০৭।
(১১) চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, শরৎরচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, স্বামী, প্রাগুক্ত, পৃ- ৮৩০।
(১২) তদেব, পৃ- ৮৩৪।
(১৩) সেনগুপ্ত, সুবোধ কুমার, শরৎচন্দ্র, এ-মুখার্জী-এন্ড- কোং, পৃ- ৫৩।
(১৪) চট্টোপাধ্যায় , শরৎচন্দ্র, শরৎরচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, একাদশী বৈরাগী, প্রাগুক্ত, পৃ-১০২৬।
(১৫) বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কররচনাবলী, পঞ্চম খন্ড, রাধারানী, মিত্র ও ঘোষ, পৃ- ৪১৩।
(১৬) চক্রবর্তী, রমাকান্ত, বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ- ১৪০।
(১৭) বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কররচনাবলী, প্রথম খন্ড, রসকলি, মিত্র ও ঘোষ, পৃ- ৪০৫।
(১৮) তদেব, পৃ-৪১৩।
(১৯) গিরি, সত্য, বৈষ্ণবপদাবলি, রত্নাবলী, পৃ-৩০২।
(২০) বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, প্রাগুক্ত, রসকলি, পৃ- ৪১৩।
(২১) সান্যাল, অবন্তী কুমার ও ভট্টাচার্য, অশোক সম্পাদিত, শ্রীচৈতন্যদেব ইতিহাস ও অবদান, নির্মলেন্দু ভৌমিক, শ্রীচৈতন্যদেব লোকমানস, সারস্বত লাইব্রেরি, পৃ- ৪৩৮।
(২২) বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, প্রাগুক্ত, রসকলি, পৃ- ৪১৬।
(২৩) চক্রবর্তী, রমাকান্ত, বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ- ১৪৪।
(২৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খন্ড, মর্ডান বুক এজেন্সী পৃ- ১২৫।
(২৫) বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, যাদুকরী, মিত্র ও ঘোষ, পৃ- ৩০৫।
(২৬) তদেব, পৃ- ৩১১।
(২৭) চক্রবর্তী, রমাকান্ত, বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ- ১৪৭।